

## ২৬ শে মার্চের ঐতিহাসিক পটভূমি

এম এম মাহবুব হাসান

“ স্বাধীনতা আমার জন্মগত অধিকার  
স্বাধীনতা আমার সমস্ত অস্তিত্বের প্রেরণার আধার  
স্বাধীনতা আমার বাঁচার অহংকার  
স্বাধীনতা আমার মাকে শত্রুমুক্ত করার দুঃসাহসিক হুংকার  
স্বাধীনতা আমার মায়ের পরিধেয় লাল-সবুজ পতাকার ”

স্বরোচিত পংক্তিগুলো দিয়ে ৩৫তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসকে সম্মান জানাচ্ছি। আর এই মহান শুভাঙ্কণে তাদেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি এবং তাদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যাদের সীমাহীন ত্যাগ, রক্ত ও ইজ্জতের বিনিময়ে ‘স্বাধীনতা’ শব্দটি লেখার স্বাধীনতা পেয়েছি। আজ আমরা স্বাধীন বাঙ্গালী জাতি। কথাটি নির্দিধায় বুক ফুলিয়ে বলতে পারছি। আমরা কখনও কখনও তোয়াক্কা করিনা এই স্বাধীনতা দিবসের সত্যিকারের ইতিহাসকে। অবশ্য এটা আমাদের রাষ্ট্রীয় সমস্যা। মনগড়া কথা শুনে ও বলে একদিকে যেমনি নিজেরাও ভুল পথে এগুচ্ছি তেমনি একই পথে এগুতে সহায়তা করছি নতুন প্রজন্মকেও। তাই একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকের স্বাধীনতা দিবসের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তথা সত্যিকারের ইতিহাস জানা অতি প্রয়োজন। কারণ এই একটি দিনের জন্য আমরা বাঙ্গালীরা আজ স্বাধীন সার্বভৌমত্ব বাংলাদেশ পেয়েছি। পেয়েছি লাল-সবুজের পতাকা। এই ইতিহাস অনেক দীর্ঘ যা এত অল্প কথায় বুঝানো যাবে না। তারপরও যেটুকু জেনেছি এবং বুঝেছি তা সকলের বোধগম্যের জন্য সংক্ষিপ্তকারে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের সাথে সাথে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয় এবং ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অভ্যুদয় ঘটে। ব্রিটিশ শক্তি দাপটের সাথে এদেশের মাটিতে ১৯০ বছর তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারে সক্ষম হয়। এরপর ১৯৪৭ সালের ১৪ ই আগস্ট জিন্মাহর দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ব্রিটিশ-ভারত বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ভারত ও পাকিস্তান বিভক্তির মধ্যে দিয়ে এদেশ থেকে ব্রিটিশ শক্তির অবসান ঘটে। স্বাধীনতা দিবসের পটভূমিতে এ কথাগুলোর আদৌ প্রয়োজন আছে কি না জানিনা তবে এ বিষয়গুলো বাদ দিয়ে সামনের দিকে এগুতেও দ্বিধাবোধ করছি। যা হোক, ১৯৪৭ সালে বাংলার যে জনগণ সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ

এলাকা নিয়ে পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তান করার জন্য বিপুল উৎসাহভরে রায় দিয়েছিল, মাত্র ২৪ বছর পরে সেই দেশের জনগণই অস্ত্র হাতে গর্জে উঠেছিল পাকিস্তান ভেঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশ করার জন্য। ১৯৭১ সালের যে শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে উঠেছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণপুরুষ, সেই মুজিবই ১৯৪৭ সালে যুবক বয়সে পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। পাকিস্তানের ঐ ২৪ বছরে শেখ মুজিব ছাড়া যে সব মহান নেতারা আমাদের দেশের জনগণকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন, আবুল কাশেম ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সহরোওয়ার্দী ও মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভষানী।

২৪ বছরের পাকিস্তানী আমলে ঘটে যায় অসংখ্য ঘটনা যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে পাকিস্তান বিভক্তির প্রশ্ন তীব্রতর হয়ে ওঠে। ১৯৪৭ সালে যেখানে ৫৬% বাঙালি নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয় সেখানে সদ্য গঠিত পাকিস্তান সরকার চিঠির খাম ও পোস্ট কার্ড ছাপায় ইংলিশ ও উর্দুতে। অর্থাৎ বাংলার কোন স্থানই ছিল না তাতে। এর প্রতিবাদে ঐ বছরই তদানিন্তন পূর্ব বাংলা মুসলিম ছাত্র লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, কামরুদ্দিন আহম্মদ প্রমুখের নেতৃত্বে ভাষা কমিটি গঠিত হয়। এর পর ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ বাংলা ভাষার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার দাবীতে শেখ মুজিবুরের নেতৃত্বে ছাত্রজনতা এক বিশাল মিছিল বের করে। শেখ মুজিবসহ বেশ কিছু নেতা কর্মি এই মিছিল থেকে গ্রেফতার হন। এটা ছিল শেখ মুজিবের প্রথম কারা বরণ। এরপর ১৯৭১ সাল পর্যন্ত মোট ২৩ বছরের মধ্যে তিনি ১৩ বছর ৯ মাস কারাবরণ করেন। গ্রেফতারের পরপরই শুরু হয় লাগাতার আন্দোলন। আন্দোলনের তোপের মূখে শেখ মুজিবসহ অন্যান্যরা মাত্র ৫দিনে খাজা নাজিম উদ্দীনের বন্দিদশা হতে মুক্তি হন। পরের কয় বছর ১১ ই মার্চকে ভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হত। মূলত ১১ ই মার্চ থেকেই ভাষা আন্দোলন ভয়াবহরূপ ধারণ করে। ২১শে মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের এক জনসভায় জিন্নাহ সাহেব ঘোষণা করেন যে, ‘উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা’। এর ক’দিন পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জিন্নাহ সাহেব ঘোষণায় পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা সম্পর্কে ঐ একই বাণী উচ্চারিত হয়। তখনই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা জিন্নাহ’র এ ভাষণে নো নো বলে প্রতিবাদ করে এবং সর্বত্র ভাষা আন্দোলনের ডাক ওঠে। অনেক ঘটনা পেরিয়ে ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারের অন্যান্য অবিচারের বিরুদ্ধে সুশৃঙ্খল ও আইনসংগত উপায়ে আন্দোলন করার জন্য মাওলানা আবদুল হামিদ খাঁন ভাষানীকে সভাপতি, সামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক এবং বিশিষ্ট যুব নেতা ও পরবর্তীতে জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচন করে নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। যার নাম দেওয়া হয় ‘আওয়ামী মুসলিম লীগ’ অর্থাৎ জনগণের মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগের অনৈতিক কার্যকলাপের জন্য পরবর্তীতে ‘আওয়ামী মুসলিম লীগ’ দলের থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেওয়া হয়।

অনেক দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে দিয়ে ১৯৫০, ১৯৫১ পেরিয়ে ১৯৫২'র ২৭শে জানুয়ারি খাজা নাজিম উদ্দিন জিন্নাহ সাহেবের অনুসরণে 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের এক মাত্র রাষ্ট্র ভাষা' বলে ঘোষণা করেন। খাজা সাহেবের এই ঘোষণায় বাংলার ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে দারুণ হতাশা ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। গুরু হয় প্রদেশব্যাপি হরতাল, ধর্মঘট ও ছাত্র বিক্ষোভ। ভাষা আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য গঠিত হয় 'সর্ব দলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ'। এর সদস্য ছিলেন, আতাউর রহমান খান, কামরুদ্দিন আহমদ, তোয়াহা, আব্দুল হাসিম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ১১ই ফেব্রুয়ারী সারাদেশে প্রস্তুতি দিবস এবং ২১শে ফেব্রুয়ারী 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে ২১শে ফেব্রুয়ারী সারাদেশে হরতাল, সভা ও শোভাযাত্রার ডাক দেওয়া হয়। এদিকে পূর্ববাংলার নুরুল আমিন সরকার ২১শে ফেব্রুয়ারীর কর্মসূচি বানচালের উদ্দেশ্যে ২০শে ফেব্রুয়ারী বিকেল থেকে ঢাকায় মিছিল ও জনসমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দীর্ঘ ১ মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করেন। কিন্তু ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকার ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দেয়। ছাত্রদের এই মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিলে গুলি ও লাঠিচার্জ করে। পুলিশের গুলিতে শফিউর, সালাম, রফিক, বরকত ও জব্বারসহ ২৬টি তাজা প্রাণ ঝরে যায় এবং ৪শ'র বেশি লোক আহত হয়। এই সকল তাজা প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয় বাঙ্গালীর প্রথম অধিকার। অর্থাৎ ২১শে ফেব্রুয়ারী যা বর্তমানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এভাবে বাঙ্গালীর সামনে শুধু বাধার পাহাড় এসে দাড়ায়। তবে ভাষা আন্দোলনের প্রেরণা বাঙ্গালীর মনে জুগিয়ে ছিল অদম্য শক্তি ও সাহস। তাইতো ১৯৫৪'র নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন সম্ভব হয়েছিল। এর পরে পাকিস্তান সরকার রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে যে বৈষম্য নীতি অনুসরণ করে আসছিল তা দূর করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৬-দফা দাবী করেন। যার প্রত্যেকটি দাবী ছিল বাঙ্গালীদের অধিকার আদায়ের দাবী। ইতিহাসে ৬-দফার গুরুত্ব ছিল অপারীসীম। ৬-দফা সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, '৬-দফা বাংলার শ্রমিক-কৃষক-মজুর-মধ্যবিত্ত তথা আপামর মানুষের মুক্তির সনদ; ৬-দফা শোষকের হাত থেকে শোষীতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ছিনিয়ে আনার জন্য হাতিয়ার; ৬-দফা মুসলিম-হিন্দু-খৃষ্টান-বৌদ্ধদের নিয়ে গঠিত বাঙ্গালী জাতীর স্বকীয় মহিমায় আত্মপ্রকাশ আর আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের চাবিকাঠি। মহান ব্যক্তিদের এসব কথা আমরা ভুলে যাই কিঞ্চিৎ স্বার্থে কিন্তু ইতিহাস কথা বলে। শত চেষ্টা করেও তা চেপে রাখা যায় না।

পূর্ব পাকিস্তান যখনই কোন দাবী তুলেছে তখনই পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা ঐ সকল দাবীর পঞ্চগতে ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের কাল্পনিক সড়যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। কারণ পূর্বের সকল

প্রকার দাবীকে ভুলুঠিত করার জন্য পাকিস্তান সরকার গ্রহণ করেছে বিভিন্ন দমন নীতি। ৬-দফা আন্দোলন দমন করার জন্যও বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয় এবং শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের বেশকিছু নেতাকর্মী গ্রেফতার হন। আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হওয়ায় ঢাকা শহরে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এঘটনার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্যে ১৩ই মে প্রতিবাদ দিবস পালন হয়। এবং বন্ধী নেতাদের মুক্তির দাবীতে ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন আওয়ামী লীগ হরতাল আহবান করেন। সরকার হরতাল বন্ধ করার জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু আওয়ামীলীগ তা উপেক্ষা করে ও সারা দেশে শান্তিপূর্ণ হরতাল পালিত হয়। পুলিশ ও ই.পি.আর. হরতাল প্রতিহত করার জন্য আওয়ামী লীগের মিছিলে গুলি ছোড়ে ফলে ১১ জন নিহত ও বহু লোক আহত হয়। এরকম রক্তোজ্জ্বল দিন পেরিয়ে চলে আসে ১৯৬৮ সালের আগর তলার ষড়যন্ত্র মামলা।

এই মামলায় শেখ মুজিবুর রহমানসহ আরো ৩৪ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ আনা হয়। শাসকগোষ্ঠীর অভিযোগ ছিল যে, অভিযুক্তরা ভারতের সহায়তায় সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে পৃথক করার জন্য আগর তলায় এক ষড়যন্ত্র করেছে। ইতিহাসে এটিই ছিল আগর তলার ষড়যন্ত্র মামলা। তবে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খাঁন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সাজিয়ে মারাত্মক ভুল করেছিলেন। কারণ এই মামলাকে কেন্দ্র করে বাংলায় পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে এবং জাতীয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবীতে ছাত্ররা সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু করে। ১৯৬৮ সালের শেষের দিকে এবং ১৯৬৯ সালের প্রথম দিকে আরও তীব্রতর হয় এবং শেষ পর্যন্ত তা গণঅভ্যুত্থানের রূপ নেয়। ১৯৬৯ সালের ৫ই জানুয়ারী পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ, ছাত্র ইউনিয়নের দু'টি গ্রুপ এবং জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের একটি গ্রুপ নিয়ে একটি সর্ব দলীয় 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। পরবর্তীতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য ১১ দফা ও শেখ মুজিবের ৬-দফা দাবী আদায়ের ভিত্তিতে আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯৬৯ এর ১৮ই জানুয়ারী থেকে এই আন্দোলন শুরু হলে পাকিস্তান সরকার ১৪৪ ধারা জারি করেন। ২০ জানুয়ারী অর্থাৎ আন্দোলনের তৃতীয় দিন ছাত্র জনতার বিক্ষোভ মিছিল ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ নির্বিচারে মিছিলের ওপর গুলি চালায় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আছাদুজ্জামান নিহত হয়। এরপর ২৪ জানুয়ারী পুলিশের গুলিতে নিহত হয় রুস্তম, মকবুল ও নবম শ্রেণীর ছাত্র মতিয়ুর রহমান। ১৫ ফেব্রুয়ারী সার্জেন্ট জহুরুল হককে ঢাকায় এবং ১৮ ফেব্রুয়ারী ড. শামসুদ্দোহাকে রাজশাহীতে নির্মভাবে হত্যা করা হয়। তারপরও থেমে থাকনি আন্দোলন। অবশেষে গণ-আন্দোলনের নিকট আইয়ুব খাঁন নতি স্বীকার করেন এবং ১লা ফেব্রুয়ারী দেশের সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আলাপ আলোচনার জন্য এক গোলটেবিল বৈঠকের আহবান করেন। কিন্তু শেখ মুজিবের এসময় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জেলখানায় ছিলেন। সুতরাং তাকে ছাড়া এ আলোচনার বৈঠক নিরার্থক।

কিন্তু আগরতলা মামলা প্রত্যাহার না করলে শেখ মুজিব গোলটেবিল আলোচনায় বসতে নারাজ। এদিকে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী শেখ মুজিবের সাথে একমত পোষন করেন। এ আন্দোলনের নানারূপ প্ররিগ্রহ করে ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা হয় এবং ২৩শে ফেব্রুয়ারী ছাত্রজনতার আয়োজনে এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। সভার প্রধান অতিথি ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান এবং সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন ডাকসু ভিপি তোফায়েল আহমদ। এই সভায় ছাত্র-জনতার সভাপতি তোফায়েল আহমদ কর্তৃক শেখ মুজিবুর রহমানকে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধি দান করা হয়। ২৬শে ফেব্রুয়ারী ছাত্রদের ১১-দফা ও মুজিবের ৬-দফার উপর আইয়ুব খান আহুত গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। স্বায়ত্বশাসনের প্রশ্নে বৈঠকের সকল আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যায় এবং স্বায়ত্বশাসনের অবমাননায় শেখ মুজিব বৈঠক বর্জন করেন ও আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। এতে আইন শৃঙ্খলার আরও অবনতি ঘটে। আন্দোলনের প্রচণ্ডতা উপলব্ধি করে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খাঁ সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল মুহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হন। যাহোক ইয়াহিয়া খান প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্বভার গ্রহণ করে শিগ্রই স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট হয়ে বসেন এবং পূর্ব ও পশ্চিমপাকিস্তানের বৈষম্যনীতি আরো জোরদার করেন। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসে এক ঘোষণায় বলেন যে, “জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে”। আওয়ামী লীগের দাবীর প্রেক্ষিতে ১৯৬৯ সালের ২৮শে নভেম্বর তিনি ঘোষণা করেন যে, আগামী ১৯৭০ এর ৫ই অক্টোবর সার্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটে জনসংখ্যার ভিত্তিতে গণপরিষদ গঠিত হবে। এছাড়া নির্বাচন ও শাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন। এর পরে এলো ৭০-এর নির্বাচন। জাতীয় পরিষদে নির্বাচনের তারিখ স্থির হলো ৭ই ডিসেম্বর এবং প্রাদেশিক পরিষদ গুলোর তারিখ স্থির হলো ১৭ই ডিসেম্বর। ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর বহুদিনের প্রতিক্ষিত পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ ৬-দফার ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে জয়ি হয়ে ৩১৩টি আসন বিশিষ্ট পরিষদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক আইন পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮টি আসন লাভ করে। পশ্চিম পাকিস্তানের ১৮৮টি আসনের মধ্যে তারা ১৪৪টি আসন লাভ করে। নির্বাচনের ফলে দেখা যাচ্ছে যে উভয় দলই তাদের নিজ এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। জুলফিকার আলী ভুট্টো নির্বাচিত হয়ে দাবী করেন যে, তিনি সারা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধি। তিনি শেখ মুজিবের ৬-দফা মানতে রাজী নন, এমনকি আওয়ামী লীগ যদি তাদের দাবী পরিবর্তন না করে তবে তিনি জাতীয় পরিষদ বর্জন করবেন বলে হুমকি দেন। কিন্তু শেখ মুজিব তার আন্দোলনে অটল থাকেন। এভাবে শুরু হলো রাজনৈতিক সংকট। সেই সাথে শুরু হয় ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে গভীর ষড়যন্ত্র। ইতিমধ্যে ভুট্টোর সাথে ইয়াহিয়ার সুদীর্ঘ আলোচনা হয়।

সম্ভবত সেখানেই তৈরী হয়েছিল বিভিন্ন চক্রান্তের নীল নকশা। ১৯৭১ সালের ১৪ই জানুয়ারী শেখ মুজিবকে ইয়াহিয়া পাকিস্তানের ভারী প্রধানমন্ত্রী বলে অবহিত করেন এবং জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে ১৫ ফেব্রুয়ারী পরিষদের অধিবেশনের ডাকার পরামর্শ দেন। কিন্তু বৈঠকের দিন ইয়াহিয়া-ভূটো জানান যে, ৬-দফা দাবীর রদবদল না হলে আমরা জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে আসবনা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে ১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তার কথা উপেক্ষা করে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ভূটোর পরামর্শক্রমে ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। এরপর থেকে শুরু হয় ইয়াহিয়া-ভূটোর একাধিক বৈঠক ও গোপন ষড়যন্ত্র। ১৫ ফেব্রুয়ারী জুলফিকার আলী ভূটো ঘোষণা করেন যে, ৬-দফা দাবীর রদবদল না করা হলে তার দল জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবেনা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য দলকেও তিনি অধিবেশনে যোগ না দেয়ার জন্য হুমকি দেন। এরপরে লাহোরে ভারতীয় বিমান ‘গঙ্গা’ ছিনতাই ও ঢাকার বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি অফিসে বোমা বিস্ফোরনের ঘটনা ঘটানো হয় যাতে অযুহাত দেখানো যায় যে, দেশের পরিস্থিতি সংকটময় এবং ঢাকার জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে বসার মত পরিবেশ নাই। ১৯৭১-এর ১লা মার্চ আকস্মিকভাবে জেনারেল ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করা হলো। ঐদন শেখ মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। এমন অসহযোগ আর কখনও হয়নি। ৩রা মার্চ ছাত্ররা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ওড়ালো। সেই পতাকা ওড়ালো সকল সরকারি অফিসে, হাইকোর্টে এবং দেশের সকল বাড়িতে। পূর্ব পাকিস্তান কার্যত স্বাধীন। শেখ মুজিবুর রহমান তার বাস ভবন থেকে যেন দেশ চালাচ্ছেন। তার প্রত্যেকটি আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে সরকারি কর্মচারী, বিচারপতি থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি নাগরিক। ইয়াহিয়া-ভূটো এলেন শেখ মুজিবের সাথে আলাপ আলোচনা করতে কিন্তু শেখ মুজিব তার ৬-দফা রদবদল করতে নারাজ। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের উপর নির্যাতনের হার আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। তারই প্রতিবাদে ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বাংলার লক্ষ লক্ষ জনতার এক উত্তপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বাংলার অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা’। তিনি জাতিকে শৃঙ্খল মুক্তির আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা করেন যে, ‘রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব- ইনশাআল্লাহ। প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা কর’। এ ভাষনে বাংলার জনমনে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তান যেন একটি পরিবারে পরিণত হয়। ঐক্যবদ্ধ হয় শত্রু হননের দৃঢ় প্রত্যয়ে। ১৬ ই মার্চ ইয়াহিয়া-ভূটো ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে

ঢাকায় মুজিবের সাথে এক আলাপ আলোচনায় বসেন এবং এই আলোচনা ২৪শে মার্চ পর্যন্ত চলে। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়না।

২৫ শে মার্চ আলোচনা অসমাপ্ত রেখেই ইয়াহিয় ঢাকা ত্যাগ করেন এবং ঐ দিন রাতেই নিরীহ বাঙ্গালীর উপর ঝাপিয়ে পড়ে পাকহানাদার বাহিনী। শুরু হয় বাঙ্গালী মা-বোনের ইজ্জত লুট ও বাঙ্গালীদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সর্বশান্ত করার মত জঘন্যতম কাজ। হাজার হাজার নিরস্ত্র বাঙ্গালীকে তারা হত্যা করে। এটাই হচ্ছে ৭১-এর গণহত্যা। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে এক লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু মধ্যরাতের পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে হানাদার পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য বাঙ্গালী সামরিক/বেসামরিক যোদ্ধা, ছাত্র, শ্রমিক, শিক্ষকসহ সর্বস্তরের জনগণের নিকট আহবান জানান। টেলিফোনে ঢাকার সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসে একটি মেসেজ ডিটেকশন দিলেন। নিজের পরিচয় দিয়ে শেখ মুজিব জানান যে, তার এই মেসেজটি যেন চট্টগ্রামের জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ হান্নানের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়। তার এই বানিটি ছিল, "The Pakistani Army has attacked Police lines at Rajarbag and East Pakistan Rifles Headquarters at Pakistan at midnight. Gather Strength to resist and prepare for a war of Independence".

এই বানী যখন চট্টগ্রামে এম এ হান্নানের নিকট পৌছাল তখন ইংরেজী ক্যালেন্ডারের তারিখ পরিবর্তন হয়ে গেছে অর্থাৎ ২৬শে মার্চ। এ জন্যই ইতিহাসে ২৬শে মার্চকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। বঙ্গবন্ধুর প্রেরিত এই ঘোষণাটি সর্বপ্রথম এম এ হান্নান সাহেবের কণ্ঠে ২৬শে মার্চ দুপুর আড়াইটায় চট্টগ্রামের কালুরঘাট ট্রান্সমিশন থেকে প্রচারিত হয়। উল্লেখ্য যে, এই ঘোষণা প্রচারের সময় বেতার কেন্দ্রটির নাম ছিল 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র'। পরবর্তীতে বিপ্লবী শব্দটি বাদ দেয়া হয়। এই বেতার কেন্দ্র থেকে তৎকালীন অস্টম রেজিমেন্টের মেজর (পরে লেঃ জেনারেল) জিয়াউর রহমান ২৭শে, ২৮শে ও ৩০শে মার্চ পরপর তিনটি ঘোষণার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা জানিয়ে দেন। ২৭শে মার্চ তিনি যে ঘোষণা দিয়েছিলেন তার কিছু অংশ এমন, "I major Zia on behalf of our great leader the Supreme commander of Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman, do hereby proclaim independence of Bangladesh". শেষটা ছিল, "May Allah help us, Joy Bangladesh".

এরপরে বাংলাদেশের সর্বস্তরে গুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর স্বাধীন হয় বাংলাদেশ। উল্লিখিত ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাঙ্গালী জাতির জন্য নিবেদিত প্রাণ। তাইতো সেদিন বঙ্গবন্ধুর আহবানে বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণ জীবন বাজী রেখে যুদ্ধ করেছিল, স্বাধীন করেছিল মাতৃভূমি বাংলাকে। আজ সেই মুজিবকে জাতির জনক হিসেবে স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করা হচ্ছে, অপমান করা হয়েছে তার ছবিকে। স্বাধীনতার ৩৫ বছর পরেও আজ স্বাধীনতা দিবসের ঘোষণা নিয়ে কথা উঠছে। স্বাধীনতার পিছনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকাকে মুছে ফেলার অপচেষ্টা চলছে। মিথ্যা দিয়ে যারা সত্যিকার স্বাধীনতার ইতিহাসকে বিকৃত করতে চায় আসলে তারাই স্বাধীনতা বিরোধী। মুক্তিযোদ্ধারা পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার দৃঢ় প্রত্যয়ে সেদিন বাংলাকে স্বাধীন করেছিলো। তারা আজ স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছে কিন্তু যে স্বাধীনতার জন্য তারা যুদ্ধ করেছিল তারা কি আজও তাদের সত্যিকারের স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে? আর স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা বাংলা মায়ের সাথে বেঈমানী করেছিল তারা ছিল ৭১-এর পরাজিত শক্তি। সেই পরাজিত শক্তি এখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন। তাদের কথায় এখন দেশ চলে। এই অপশক্তিকে রুখতে প্রয়োজন আরেকটি শত্রু হননের যুদ্ধ। তবে ‘সত্যের মৃত্যু নাই’ কথাটি যদি ঠিক হয় তাহলে আবারও এই অপশক্তির নির্মূল অনিবার্য। বাংলার মাটি যেন আরেকটি জয়ের জন্য অপেক্ষমান।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

- ১। মুক্তিযুদ্ধ : বিভিন্ন দৃষ্টি কোন থেকে - ছদরুদ্দীন।
- ২। বিবিধ প্রসঙ্গ - হায়দার আকবর খান রনো।
- ৩। বাংলাদেশের জন্ম - রাওফরমান আলী খান।
- ৪। বঙ্গবন্ধু - এম আর আখতার মুকুল।
- ৫। বাংলাদেশের ইতিহাস পরিক্রমা - কে এম রাইছউদ্দীন খান।
- ৬। বাংলাদেশ: রাষ্ট্র ও সমাজ - অনুপম সেন।
- ৭। দৈনিক ভোরের কাগজ- ২০শে ফেব্রুয়ারী ২০০৪ ইং
- ৮। দৈনিক ভোরের কাগজ - ২২ শে মার্চ ২০০৪ ইং

### লেখক পরিচিতি :

এম এম মাহবুব হাসান  
ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক

সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার, মাসিক উপকূল পরিবেশ বার্তা, খুলনা।

লিয়াজো অফিসার, কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশীপ (সিডিপি), ৫৫/২ ইসলামপুর রোড, খুলনা।

ফোন : ০৪১-৮১০৫৭৩, মোবাইল : ০১৭৬-৫৬৯২১২, ই-মেইল : mahbub\_cdp@yahoo.co.uk